জাতীয় বাজেট ২০২৩-২৪ ও টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন
অর্থপাচার রোধে কার্যকর উদ্যোগ ও জিডিপি'র ৩.২ শতাংশ জলবায়ু অর্থায়নের দাবী

১. দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি কি সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারছে ?

স্বাধীনতার পর গত পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশ যথেষ্ঠ অর্থনৈতিক উন্নতি /অগ্রগতি অর্জন করলেও সুষম উন্নয়ন হয়েছে কিনা তা আজ সবার সামনে একটি বিরাট প্রশ্ন। বাংলাদেশের অর্থনীতির আকার ১৯৭২ সালের ৮.৯ বিলিয়ন ডলার থেকে বর্তমানে ৪৩২ বিলিয়ন ডলার [প্রায় ৫০ লাখ কোটি টাকা] অর্জন করলেও দারিদ্র বিমোচনে রাষ্ট্রের কার্যকর প্রতিশ্রুতি ও নীতি কাঠামোর দুর্বলতার কারনে কোন সুষম উন্নয়ন তো দুরের কথা বরং সাধারন ও দরিদ্র জনগোষ্ঠী এই উন্নয়েনর নূন্যতম সুফল ভোগ পারছে কিনা তা আজ প্রশ্নসাপেক্ষ । আমাদের মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী গত বছর এক সভায় বলেছিলেন আমরা মানুষের দুবেলা ভাত অন্তত: নিশ্চিত করতে পেরেছি। তার এই কথায় দারিদ্র বিমোচন ও সুষম উন্নয়ন নিশ্চিতকরনে সরকারের এই সীমাবদ্ধতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। গত পঞ্চশ বছরে কথিত দারিদ্র বিমোচন সাফল্য এসকল জনগোষ্ঠীর একটা বিরাট অংশ দুবেলা খেয়ে-পরে বেচেঁ থাকছে বলেই আমরা মনে করি। অর্থনৈতিক উন্নতির অবশ্যম্ভাবি ফলাফল হিসাবে এসকল জনগোষ্ঠীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অধিকার ও সামাজিক মর্যাদার কোন উন্নতি বা কাংখিত অগ্রগতি এখোনও অনেক দুরে, যেটা এদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা এবং আপামর জনগন রাষ্ট্র থেকে আশা করেছিল।

অ-জনগনকরনের রাজনৈতিক অর্থনীতি [Political Economy of De-population] নামে জনাব আবুল বারাকাতের সম্প্রতি এক গবেষনা প্রবন্ধ প্রকাশ হয়েছে যেখানে তিনি দেখিয়েছেন গত ৫০টি জাতীয় বাজেটে মোট বরাদ্দের মাত্র ১৩% দরিদ্র শ্রেনী বিশেষ করে প্রান্তিক কৃষক, নিম্নবিত্ত দরিদ্র, গ্রামীন নারী ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল এমন জনগগোষ্ঠীর জন্য বরাদ্দ দিয়েছে বাকী ৮৭ ধনীদের দখলে গেছে, আদতে লুট করা হয়েছে। অথচ এরাই দেশের প্রধান জনগগোষ্ঠী এবং বাজেটে এদের প্রতি কম বরাদ্দ দেওয়ার কারনে বাড়ছে ক্রমবর্ধমান বৈষম্য।

২. ঘোষিত জাতীয় বাজেট কতটা সুষম উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনে কার্যকর

রাষ্ট্রের এই নীতি কাঠামোর দুর্বলতা রেখেই চলতি অর্থবছরে সরকার ৭,৬১,৭৮৫ কোটি টাকার আর একটি জাতীয় বাজেট উপস্থাপন করা হয়েছে। বাজেটের আয়-ব্যয় প্রায় সমান, বিনিয়োগের জন্য উদ্বৃত্ত তহবিল [মাত্র ২৪,৭১৯ কোটি টাকা] না থাকার মতই। তথাপি ২,৫৭,৮৮৫ কোটি টাকা ঋণ করে বিনিয়োগের পরিকল্পনা করা হয়েছে, এই ঋণ ও বিনিয়োগের ধরন থেকে এটা স্পষ্ট যে এই বাজেট দরিদ্র জনগোষ্টীর দারিদ্র বিমোচনের পরিবর্তে বরং ব্যবসায়ী, বণিক এবং তথাকথিত পূজিঁবাদী গোষ্ঠীর স্বার্থই রক্ষা করবে। তাদের স্বার্থ রক্ষা হলেই সেখান থেকে কিছু সম্পদ দরিদ্র আপামর জনগোষ্ঠীর জন্য ব্যয় করা হবে। সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে খাদ্য নিরাপত্তার পাশাপাশি বৃহৎ জনগগোষ্ঠী সামাজিক উন্নয়নের জন্য [শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি খাত] প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। জাতীয় পঞ্চবার্ষিক পরকিল্পনায় সরকার এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ [যদিও চাহিদার তুলনায় কম] করার প্রতিশ্রুতি দিলেও জাতীয় বাজেটে সরকার সে প্রতিশ্রুতি না রেখে বরং পূজিঁপতি এবং বণিকদের স্বার্থ-সংশ্লিস্ট বিনিয়োগকে [যোগাযোগ ও পরিবহন অবকাঠামোর উন্নয়ন, যেটা সরাসরি দেশের বণিক শ্রেনী এবং পুজিপতিদের স্বার্থ রক্ষা করবে] প্রাধান্য দিচ্ছে।

চলতি জাতীয় বাজেটেও সরকারের এই ভূমিকা স্পষ্ট। উদাহানস্বরূপ বলতে পারি ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সামাজিক উন্নয়ন বিশেষ করে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে প্রতি বছর বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার [এডিপি] যথাক্রমে ১৬.৫ শতাংশ এবং ১১.১ শতাংশ বরাদ্দের প্রতিশ্রুতি থাকলে বিগত অর্থবছরগুলোতে সরকার তার চেয়ে অনেক কম [৫-৭ শতাংশ কম হারে] বরাদ্দ দিচ্ছে। চলতি অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটেও পরিকল্পনায় দেওয়া প্রতিশ্রুতি থেকে সরকার সরে এসেছে এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বিনিয়োগ বরাদ্দের প্রস্তাব করেছে যথাক্রমে ১৩.৩ এবং ৬.১৬ শতাংশ। পক্ষান্তরে পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে [যেটা পূজিবাদের স্বার্থ ও সম্পদ পূঞ্জীকরনে সহায়তা করতে পারে] বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার ২৮.৮৮ শতাংশ [পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ১৭.৪ শতাংশের বিপরীতে] বিনিয়োগ প্রস্তাব করা হয়েছে। এই ছোট্ট একটি উদাহারন থেকে এটা নিশ্চিত বলতে পারি যে, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে পরিকল্পনার চাইতে কম বিনিয়োগ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সম্পদ বহিঃগমনে সহায়তা করবে এবং সেই সম্পদ বণিক শ্রেনী ও পূজিঁপতিদের দারা কুক্ষিগত হবে। ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হলেও আর্থ-সামাজিক অসমতা ভবিষ্যতে দারিদ্রের ব্যপকতা ও তীব্রতা আরও বৃদ্ধি করবে।

৩. আর্থ-সামাজিক অসমতা দুর করা অবশ্যই সম্ভব

ক সরকারী বিনিয়োগ বাড়াতে অবশ্যই প্রতক্ষ কর আদায়ে জোড়দার এবং পুজিঁ পাচার রোধে ব্যবস্থা নিতে

প্রতি বছরর ন্যায় এবারও প্রস্তাবিত বজেটে ২,৫৭,৮৮৫ কোটি টাকা ঘাটতি রয়েছে যা মোট প্রস্তাবিত বাজেটের ৩৪% বা এক তৃতিয়াংশেরও বেশি। এই ঘাটতি মোকাবেলার জন্য সরকারকে রাজস্ব আদায়ের পাশাপাশি ব্যাপকভাবে বৈদেশিক ও আভ্যন্তরিন ঋনের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। সরকার প্রস্তাবিত বাজেটে মোট ৫ লক্ষ কোটি টাকা রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্র নির্ধারন করেছে, যা গত বছরের লক্ষ্যমাত্রা হতে ১৫% বেশি। সরকার রাজস্ব আদায়ের যে লক্ষ্যমাত্র নির্ধারন করে তা কোন বছরই গড়ে ৭০% এর বেশি অর্জন করতে পারে না। তাই রাজস্বব আদায়ে সহজ পথ হিসেবে ভ্যাট বা মূল্য সংযোজন কর তথা পরোক্ষ করের উপর সরকার বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে যার বেশিরভাগ চাপ গরীব ও সাধারন মানুষের উপর বর্তায়।

অথচ ধনী এবং বহুজাতিক কোম্পানী সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যে হারে আয়কর গোপন করে এবং বিভিন্ন দেশে (কর সর্গরাজ্য) অর্থ পাচার করে তার দিকে নজর না দিয়ে সাধারন মানুষের উপর একের উপর এক করের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)- এর মতে বিভিন্ন ব্যক্তি এবং কোম্পানি প্রকৃত আয় গোপন ও ব্যবসায় লোকসান দেখিয়ে গত এক দশকে প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকার কর ফাঁকি দিয়েছে। অন্যদিকে Global Financial Integrity (GFI) এর রিপোর্ট অনুযায়ী ২০০৮ থেকে ২০১৫- এই ৭ বছরে আমদানি-রপ্তানির সময়ে পণ্যের প্রকৃত মূল্য গোপন, বিল কারচুপি, ঘুষ, দুর্নীতি, আয়কর গোপন ইত্যাদির মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে বিদেশে পাচার হয়েছে ৪,৪৮,২৫৬ কোটি টাকা- অর্থাৎ প্রতি বছর গড়ে প্রায় ৬৪,০০০ কোটি টাকা। উক্ত টাকা ২টি পদ্মা সেতু বা ২টি মেট্রোরেল করা সম্ভব। দুদক এর মতে বিদেশে পাচার করা অর্থের ৮০ শতাংশই হয়ে থাকে আমদানি-রফতানি বাণিজ্যের আড়ালে।

দেশে করদাতা শনাক্তকরণ নম্বরধারী (টিআইএন) ৮৪ লাখের বেশি যা মোট জনগনের ৫%। সে হিসাবে চলতি ২০২২-২৩ করবর্ষে নিবন্ধিত করদাতার মাত্র ৩৩% রিটার্ন জমা দিয়েছে যা মোট জনগনের ২%, বাকি ৬৭% জমা দেয়নি। এবারই প্রথম আয়কর রিটার্ন জমাকারীদের সকলকে ন্যুনতম ২,০০০/- টাকা কর প্রদানের প্রস্তাব করা হয়, অর্থাৎ করযোগ্য আয় না হলেও এই আয়কর প্রদান করতে হবে, যা আগে এ নিয়ম ছিলনা। বর্তমানে বার্ষিক করমুক্ত আয় সীমার পরিমান ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত যা নতুন বছর হতে আর থাকবে না এবং যা সাধারন মানুয়ের জীবন মানে সরাসরি বিরূপ প্রভাব ফেলবে বলে আমরা মনে করি।

বাংলাদেশে রাজস্ব আদায় ব্যবস্থাপনার অন্যতম দুর্বল ভিত্তি হচ্ছে অপ্রদর্শিত অর্থনীতি বা কালো টাকা যার সম্ভাব্য পরিমাণ জিডিপি'র ৪০% হতে ৮০% পর্যন্ত। এর গড় হিসেবে ৬০% বাদ দিয়ে ৫০% হিসেবে চলতি অর্থবছরে সম্ভাব্য কালো অর্থনীতির (সংশোধিত জিডিপি হিসেবে) পরিমাণ ২২লাখ কোটি টাকারও বেশি এবং যা চলতি অর্থ বছরের জাতীয় বাজেটের প্রায় ৩ গুনেরও বেশি। ব্যয় মেটানো, কাম্য রাজস্ব আদায় ও ঋণের উপর নির্ভরশীলতা কমানোর জন্য সরকারকে অর্থপাচার বন্ধ, বহুজাতিক কোম্পানী সহ ধনী ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কর গোপন বন্ধ এবং কালো টাকা আদায়ে তৎপর হতে হবে।

৪. বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়নের প্রেক্ষাপট ও প্রয়োজনীয়তা

বাংলাদেশের সরকারী হিসাবেই প্রায় ২০-২৫ মিলিয়ন জনগোষ্ঠী উপকূলীয় অঞ্চলের অধিক ঝুকিঁপুর্ন এলাকায় বাস করে। এক্ষেত্রে সরকারের পরিসংখ্যান যদিও বলছে উপকূলীয় অঞ্চলের সুরক্ষায় পর্যাপ্ত বাঁধ রয়েছে কিন্তু বাস্তবতায় সেগুলোর বেশিরভাগই পায়ে হাটার পথের মত, মোটেই দুর্যোগ সহনশীল নয়, এগুলোর গড় উচ্চতা কোথাও ৩ ফুট আবার কোথাও ৫ ফুট। কৃষি ক্ষেত্রেও উপকূলের দুর্দশা অবর্ননীয়। ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস, লবনাক্ততা ও জলাবদ্ধতা কারনে কৃষির উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান। জীবন-জীবিকার সংকটে পরে মানুষ উপকূল থেকে শহরে স্থানান্তর হচ্ছে এবং আরও কঠিন সংকটের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। উপকূলের বাইরেও বিশেষ করে নদী ভাঙ্গন, হাওর অঞ্চলে অকাল বন্যা কৃষি উৎপাদনকে ক্ষতিগ্রস্থ করছে এবং খাদ্য সংকট সৃষ্টি করছে। জাতিসংঘের গবেষনা প্রতিবেদন বলছে, বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ে বাংলাদেশে প্রতি বছর ৩২০ কোটি ডলার বা ২৫ হাজার ৬০০ কোটি টাকার ক্ষতি হয়, যা মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ২ দশমিক ২ শতাংশ। এই ধরনের ক্ষয়-ক্ষতির চিত্র টেকসই উন্নয়নকে প্রতিফলন করে না। কোটি কোটি জনগোষ্ঠীকে অরক্ষিত ও ঝুঁকিপূর্ন অবস্থায় রেখে টেকসই উন্নয়ন কতটা সম্ভব সেটাও যথেষ্ট বিবেচনার দাবি রাখে।

৫. সরকারের বিভিন্ন কৌশলগত পরিকল্পনাসমুহও জলবায়ু অর্থায়নের প্রয়োজনীয়তাকে সমর্থন করে

সরকার জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা এবং সহনশীলতা অর্জনের উদ্দেশ্যে ডেল্টা প্লান ২১০০, জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা

গত ৫ বছরের জলবায়ু সম্পৃক্ত বাজেট বিশ্লেষণ

অর্থবছর	মোট জাতীয় বাজেট কোঃ টাঃ	মোট জলবায়ু বাজেট	জিডিপি'র %
২০১৮-১৯	৪৬৪৫৭৩	১৮৯৪৮.৭৬	০.৭৫%
২০১৯-২০	৫২৩১৯০	২৩৫৩৮.৩২	০.৮২%
২০২০-২১	৫৬৮০০০	২৪০৭৫.৬৯	০.৭৬%
২০২১-২২	৬০৩৬৮১	২৫১২৪.৯৮	০.৭৩%
২০২২-২৩	৬৭৮০৬৪	৩০৫৩১.৯৯	০.৬৯%

তথ্যে উৎস: বিভিন্ন অর্থবছরের জলবায়ু অর্থায়ন বাজেট প্রতিবেদন সমূহ

২০৫০,

এনডিসি ২০৩০ [স্ব-প্রনোদিত গ্রীণ হাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাস পরিকল্পনা ২০৩০] নামে বেশ কয়েকটি কৌশলগত পরিকল্পনা প্রনয়ন ও বাস্তবায়নের চেষ্টা করছে। এসকল কৌশলগত পরিকল্পনায় গৃহীত প্রকল্প ও কর্মসুচীসমুহ স্বল্পমেয়াদী অর্থাৎ বার্ষিক পরিকল্পনা করা হয়েছে সেগুলোর সঠিক বাস্তবায়ন করতে হলে প্রতি বছর সরকারকে ১,৮৩,০০০ কোটি টাকা বা জিডিপি এর প্রায় ৩.২ শতাংশ বিনিয়োগ করতে হবে।

চলতি অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে ২৫টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দে মাত্র ৩৭,০৫১ কোটি টাকা রাখা হয়েছে যা মোট জাতীয় বাজেটের ৪.৮৬ শতাংশ এবং জিডিপি'র মাত্র ০.৭৪ শতাংশ। জলবায় বিষয়ক উন্নয়ন বরাদ্দ ২২,৯৫৫ কোটি টাকা যা মোট উন্নয়ন বরাদ্দের ৮.৭২ শতাংশ। বিগত পাচঁ বছরের সরকারের জলবায়ু অর্থায়ন প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে, জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ পর্যালোচনায় ক্রমবর্ধমান হারে বরাদ্দ হ্রাসের চিত্রই আমরা দেখতে পাচ্ছি। বিশেষজ্ঞদের মতে পরিকল্পনা অনুযায়ী বর্তমানের এই বরাদ্দ ঝুঁকি মোকাবেলায় যথেষ্ট নয় এবং ভবিষ্যতে যে ঝুঁকি সৃষ্টি হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে তা মোকাবেলায় যথেষ্ট অপ্রতুল। আমরা মনে করি সরকার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আন্তরিক এবং প্রয়োজনীয় বরাদ্দ বাজেটে নিশ্চিতকরনের পদক্ষেপ নিবেন।

৬. জাতীয় বাজেটে ও জলবায়ু অর্থায়নের ক্ষেত্রে সরকারের কাছে আমাদের সুপারিশসমূহ

ক. পৃথক জলবায়ু অর্থায়নের পরিবর্তে একটি "সামগ্রিক ও সমন্বিত জাতীয় জলবায়ু বাজেট" চাই

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এমন কোন উন্নয়ন খাত নেই যেটা জলবায় পরিবর্তনের করনে ক্ষতিগ্রস্থ বা নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত হবে না। তাহলে পৃথক জলবায়ু বাজেটের কেন প্রয়োজন? সরকার ২০১৫ সাল থেকে প্রতি বছর জাতীয় বাজেটে জলবায়ু অর্থায়ন নামে নতুন এবং আলাদা বরাদ্দ দিয়ে আসছে। এটা আসলে নতুন কিছু নয়। কারন ২০-২৫ বছর আগেও জলবায়ু অর্থায়ন বিষয়টি সামগ্রিক বাজেটের সাথে সমন্বিত ছিল যা বর্তমানে আলাদা করে দেখানো হচ্ছে মাত্র। ২০-২৫ বছর আগেও বরাদ্দ যা ছিল [জিডিপি'র ১% এর কাছাকাছি] এখন তাও কমে যাচ্ছে।

জলবায়ু অর্থায়নকে জাতীয় বাজেটে পৃথক করে দেখানোর প্রধান উদ্দেশ্য সরকার জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় আন্তারিক এবং বৈশ্বিক ক্ষেত্রেও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এটা দেখানো। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সরকার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সরকার জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় অধিক গুরুত্ব দিচ্ছে বললেও বিষয়টি বাজেটে সেভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে না। আমরা মনে করি এই জায়গাটিতেই বাজেট প্রনয়ন ও বরাদ্দের ক্ষেত্রে সরকারের নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন দরকার।

আমরা মনে করি জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় প্রনীত সকল কৌশলিক পরিকল্পনা টেকসই অর্থনীতি ও দারিদ্র দূরীকরনে অপরিহার্য এবং অর্থনীতি এবং সকল উন্নয়ন খাতেই জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়টির প্রতিফলন দরকার যেটা একটি জাতীয় ও সমন্বিত জলবায়ু বাজেট প্রনয়নের মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব। সুতরাং সরকারকে বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করা এবং জনগনের মতামত নেওয়া উচিৎ যাতে বাজেটের কাঠামোগত পরিবর্তনের মাধ্যমে একটি সমন্বিত জলবায়ু বাজেট প্রনয়নের উদ্যোগ নেওয়া যায়।

খ. জলবায়ু অর্থায়নে সরকারের পরিকল্পনা ও প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী জিডিপির কমপক্ষে ০৩ শতাংশ বরাদ্দ ও বিনিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে

আমরা আগেই বলেছি যে, সরকার জলবায়ু পরিবর্তনের বর্তমান ও ভবিষ্যত নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলার উদ্দেশেই যে সকল দীর্ঘমেয়াদী ও কৌশলগত পরিকল্পনা প্রনয়ন করেছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য প্রয়েজনীয় অর্থায়নেও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সুতরাং সরকার তার ঘোষিত জাতীয় বাজেট পুনঃবিবেচনা করবেন এবং চলতি বছর কমপক্ষে ১,৮৩,০০০ কোটি টাকা বা জিডিপি'র ৩.০ শতাংশ বরাদ্দ নিশ্চিত করার পাশাপাশি ভবিষ্যত বাজেটেও তা অব্যাহত রাখবেন।

গ. জলবায়ু পরিবর্তন ও উপকূল সুরক্ষাঃ বাঁধ নির্মান কার্যক্রম সরকারের অগ্রাধিকার বিনিয়োগ খাত হিসাবে অন্তর্ভূক্ত হওয়া উচিৎ

উপকূলীয় সুরক্ষার প্রধান কাঠামোগত উপাদান ও কৌশল হচ্ছে কার্যকর বেরীবাঁধ নির্মান। গত কয়েক বছরের আমাদেও অভিজ্ঞতা হচ্ছে বাজেটে বাধঁ নির্মানের উপর কোন বাজেট নাই, যা আছে তা শুধু মেরামত সংস্কার করা জন্য। কেন এমনটি হচ্ছে? কারন বাজেট প্রনয়নের বিষয়টি এখন বর্জুয়া ও বণিক গেষ্ঠীর নিয়ন্ত্রনে এবং তারা উপকূলের বিপদাপন্ন এলাকায় বাস করে না। তাদের যদি কোন প্রকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন বা প্রকল্প বাস্তবায়ন করে সেখানেই বা সে অংশটুকুতেই তারা বাধঁ নির্মান বিষয়টি প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত করে, যার ফলে জাতীয় বাজেটে বাধঁ নির্মানের সামগ্রিক বিষয়টি ক্রমাগত উপেক্ষিত হচ্ছে।

অথচ বিশ্বব্যাংকের তথ্যমতে উপকূলীয় এলাকা বাংলাদেশের মোট ভূমির ৩২%, প্রায় ২.৫ কোটি মনুিষ উপকুলের অতি বিপদাপন্ন এলাকায় বাস করে এবং ২০৫০ সাল নাগাদ সেখানে জনসংখ্যা দাড়াতে পারে প্রায় ৬০ মিলিয়ন বা ছয় কোটি। জনসংখ্যার এই ক্রমবর্ধমান হার এবং তাদের আর্থসামাজিক সক্ষমতার অভাব মানুষকে অতিবিপদাপন্ন উপকূলীয় এলাকায় অভিবাসন এবং বসবাস করতে বাধ্য করছে। সুতরাং সরকারের দায়ীত্ব রয়েছে এই বিশাল অভিবাসী দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে পরিকল্পনা মাফিক সমর্থন দেওয়া এবং তাদের জীবনযাত্রা অধিকতর নিরাপদ করার জন্য বাধঁ নির্মানকে অগ্রাধিকার খাত বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত করা।

কোস্ট ফাউন্ডেশন
যোগাযোগ; আমিনুল হক। ০১৭১৩৩২৮৮১৫